

Vol. 29 | No. 2 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাহিত্যে অনুকৃতি ও পরিউপস্থাপন

Volume	29
Issue	2
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	February 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i2.4
Pages	125-142
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্যে অনুকৃতি ও পরিউপস্থাপন

আনিসুজ্জামান

সাহিত্যের উৎপত্তি ও তার শৈল্পিক বা নান্দনিক উৎকর্ষ বিচার নিয়ে দার্শনিক ও সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মত-বিরোধ রয়েছে। ভাববাদী ও মনায়ধর্মী (Subjective) উপাদান বাদ দিলে নিছক বস্তুনিষ্ঠ ও প্রতি-নিধিত্বশীল কোন সাহিত্য সম্ভব কিনা—এ-এক জটিল প্রশ্ন। সন্দেহবাদী সমালোচকরা একে সংবাদপত্রের নির্জলা প্রতিবেদনের অধিক গুরুত্ব দিতে নিস্পৃহ। তথ্য সরবরাহ করাই যদি সাহিত্য না হয়, এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে বিশুদ্ধ খবর সাহিত্য নয়, তাহলে এই অতিরিক্ত উপাদানটি কি যা তথ্যকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করতে পারে? অথবা বিষয়টি কি এমন প্রকৃতির যে তথ্য-নির্ভর কোন সাহিত্যই সম্ভব না? সাহিত্যের মূল উপজীব্য কি তথ্য ও সত্য না সংবেদনশীল মানবমন ও তার আকাঙ্ক্ষা? সাহিত্যের লক্ষ্য কি তথ্যকে সফলভাবে তুলে ধরে প্রচারধর্মী হওয়া এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কারধর্মী ভূমিকা পালন করা, না মানব-চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করা ও কল্পনার স্ফূর্তি দেয়া? এ-প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে এ-প্রশ্নগুলোর সব দিক নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমি এ-প্রশ্ন-গুলোর সাধারণ দিকের আলোকে প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্য যে সম্ভব মূলত এ-বিষয়টির দার্শনিক দিকটিই এখানে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করবো।

প্রথমে আমি ধরে নেব যে সাহিত্যের মূল উপজীব্য তথ্য বা সত্য নয় এবং এর লক্ষ্যও প্রচারধর্মী বা সংস্কারমূলক নয়; বরং এর মূল উপজীব্য মানবমন ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং এর লক্ষ্য কল্পনার স্ফূর্তির মাধ্যমে মানবচিত্তে আনন্দের সঞ্চার করা। কিন্তু পরিশেষে আমি প্রমাণ করতে চাইবো যথার্থ সাহিত্য তথ্য ও সত্য নিরপেক্ষ হতে পারে না এবং সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ-পরিবর্তনের মহান আদর্শ হতে দূরেও থাকতে পারে না।

অনেকের ধারণা প্রথম থেকেই মানুষের মন ও আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। নইলে মানুষ সহজ স্থূলতা ও নৈরাজ্যের দিকে চলে যাবে। আর এ-জন্য শক্তিশালী প্রচার ও সংস্কারধর্মী সাহিত্য দরকার। আমার মনে হয় এ-ধারণা ভয়ানক একদেশদর্শী এবং মানব-প্রকৃতির মূল চাহিদা সম্বন্ধে নিদারুণ অজ্ঞতার পরিচায়ক। এ-মতবাদীরা সব সময়ই বাইরে থেকে কিছু চাপিয়ে দেয়ায় বিশ্বাসী। এরা সাধারণ মানুষের অন্তঃস্থ ক্ষমতা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি আস্থাহীন। মানব প্রজাতির বহিঃস্থ-নিয়ন্ত্রণমুক্ত ক্রম-বিবর্তনে যেন এঁরা শংকিত হন এবং সেজন্য সব সময়ই তাকে কোন-না-কোন ভাবে একটি কল্পিত রক্ষাকবচের চৌহদ্দীতে আবদ্ধ রাখতে পারলে নিশ্চিন্ত বোধ করেন। সাধারণ মানুষের মানধিক গুণাবলীর স্বজনশীল বিকাশের সম্ভবনায় সন্দেহ এবং শাস্ত্র বা অতিমানবত্বে মাত্রাতিরিক্ত আস্থার কারণে এঁরা প্রায়শ অসচেতনভাবে একটি প্রকৃতি বিরোধী মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্যহীনতার শিকার। মানসিক এই দ্বন্দ্ব ও ভারসাম্যহীন অবস্থার জন্য এঁরা পরিবর্তনে ভীত এবং অতীতচারিতায় তৃপ্ত। অথচ একটি সহজ সত্য বিস্মৃত না হলে এঁরা এ-অমূলক সন্দেহ ও দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন না। সেটি হলো মানুষের ক্ষেত্রে কোন আদর্শ বা নির্দেশের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রযোজ্যতা এখানে যে সে তা গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে; এবং এ-গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে তার ব্যক্তিক অংশগ্রহণই সে-আদর্শ বা নির্দেশকে অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে এবং যথার্থ মানবিক মর্যাদা দেয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এই যে টেবিলে বসে আমি এখন লিখছি, তাকে কোন নির্দেশ বা প্রগ্রাম দেয়ার কথা অবান্তর, কারণ টেবিল তা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু একটি অত্যাধুনিক কমপিউটার বা রোবটের ক্ষেত্রে কোন নির্দেশ বা প্রগ্রাম দেয়া অবান্তর নয়; তবে সে-ক্ষেত্রে তা মানবিক মর্যাদা ও দায়দায়িত্ব সমৃদ্ধ নয়। অর্থাৎ কমপিউটার বা রোবট নির্দেশ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারলেও তার এ-অংশগ্রহণ স্বজনশীল নয়। অন্যকথায়, কমপিউটার নির্দিষ্ট প্রগ্রামকে অতিক্রম করে নিজস্বভাবে কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা; অথবা নেতিবাচকভাবে বললে, সচল থাকা অবস্থায় নির্দিষ্ট প্রগ্রামে সাড়া না দিয়ে পারে না। কিন্তু একজন মানুষ সুস্থ ও স্বাভাবিক থেকে এবং পূর্ণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নির্দেশিত কাজ না করতে পারে, ইচ্ছা করে ভুল করতে পারে ইত্যাদি। বস্তুত ব্যক্তির এই সচেতন ও স্বজনশীল অংশগ্রহণ বা

অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি বা অসহযোগিতা তার ইচ্ছাশক্তির ও মানবিক-মাত্রার (human dimension) পরিচায়ক এবং সেজন্য তা প্রশংসা বা নিন্দার বিষয়। তাই নির্দেশ গ্রহণের কোন অন্ধ ও যান্ত্রিক ক্ষমতা নয় বরং স্থান ও কালভেদে ব্যক্তির উল্লেখিত ভূমিকাই তাকে প্রাণহীন যন্ত্র বা সপ্রাণ অন্যান্য জীবকুল হতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করে।[১] সুতরাং মানব প্রকৃতির এ-মৌলিক দিকটি উপেক্ষাকারী চিন্তাবিদরা আসলে অজ্ঞাতে ও সরল বিশ্বাসে মানুষকে এক ধরনের আধ্যাত্মিক বা আদর্শিক যন্ত্রে পরিণত করতে চান। অথচ এটি স্রষ্টার ইচ্ছাও নয়।[২]

অধিকন্তু, এ-সব দার্শনিকেরা এ-বিষয়টি বিবেচনা করেন না যে মানুষকে যদি পরিপূর্ণ স্বাধীন ভাবেও চিন্তা করতে দেয়া হয়, তবুও তার সে-চিন্তা অন-পেক্ষভাবে অবাধ হতে পারেনা। অভিজ্ঞতাবাদের বিশিষ্ট দিকপাল হিউম অনেক আগেই এ-কথা প্রমাণ করেছেন।[৩] আমরা কেবল তা-ই ভাবতে এবং ভাষায় প্রকাশ করতে পারি যার মূল ভিত আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে। অভিজ্ঞতাই আমাদের জ্ঞানের আণবিক ভিত্তি। কল্পনা কেবল অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত এ-মূল ইন্দ্রিয় ছাপগুলোকে সংযুক্ত, বিযুক্ত ও সংহত করতে পারে। সেভাবে গঠিত জটিল ধারণার নির্দেশক হিসেবে কোন বাস্তব বস্তু জগতে থাকতে না পারে, কিন্তু তার মূল উৎস অভিজ্ঞতালব্ধ। যেমন মৎস্য কন্যা বা ড্রাগন। বাস্তবে এমন কোন একক প্রাণী নেই। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে তাদের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে এমন প্রাণী জগতে আছে। শক্তি, গুণ বা উপাদান সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। এজন্য বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে পারমার্থিক জীবনের বর্ণনার ক্ষেত্রে বা রূপকথায় আমরা পার্থিব জীবনের বস্তু, অনুভূতি বা উপাদানেরই এক ভিন্নতর সমাবেশ লক্ষ্য করি। বস্তুত, ভাষা প্রতিকৃতি বা প্রতীক বিশেষ। সেজন্য জটিল কোন অনু-ভূতি বা অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন উপমা, উৎপেক্ষা, সাদৃশ্য বা রূপকল্প ব্যবহার করে সে-অনুভূতি বা অবস্থাকে সবাক বা বাঙময় করে তোলার চেষ্টা করি। অপরদিকে সর্বগ্রাসী সন্দেহ দ্বারাও যদি কেউ তাড়িত হয়, তবুও সে তার নিজেকে সন্দেহ করতে পারেনা ; কারণ সন্দেহ-প্রক্রিয়াই সন্দেহকারীর অস্তিত্বের নির্দেশক। সুতরাং জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়ায় আত্ম-চেতনাই যে সূচনা-বিন্দু এ নিঃসন্দেহে ডেকার্টের বৈপ্লবিক আবিষ্কার।[৪] এজন্য কোন শিক্ষণপদ্ধতি বা আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারেনা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেখানে উপেক্ষিত হয়। সাধারণ ব্যক্তি-মানুষের অন্তঃস্থ সুকুমার

বৃত্তিতে সন্দেহ পোষণ করে ব্যক্তি বা সমাজ-সংস্কারের চিন্তা স্ববিরোধী এবং আত্মঘাতী।

এখন আমি যুক্তি দেব এ-অভিযোগের বিরুদ্ধে যে প্রথম থেকেই মানুষের চিন্তা আদর্শ-শাসিত না হলে তা জৈবিকতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং স্বার্থ-পর আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে ঠেলে দেবে। একথা সত্যি যে মানুষের মধ্যে জৈবিকতা আছে; শুধু তা-ই নয়, এটা তার অস্তিত্ব ও বিকাশের অপরিহার্য শর্ত। সন্দেহ নেই মানুষের মধ্যে স্বার্থচিন্তা এবং আত্মকেন্দ্রিক মাত্রা আছে। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাসের অগ্রগতির প্রতি সংস্কারমুক্ত মনে ও খোলা চোখে তাকাই তাহলে দেখবো জৈবিকতা যেভাবে মানব-প্রজাতির ক্রম-ধারাকে বহমান রেখেছে, ঠিক তেমনি মানুষের স্বার্থচিন্তা ও আত্মকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যই তাকে স্থৈর্য দিয়েছে এবং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিদ্যমান দুটি উপাদান: স্বার্থবুদ্ধি ও পরার্থপরতা—দু' দিক, ব্যক্তি ও সমাজ—এর নির্দেশক এবং এ-দুটির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি বা অবনতি হতে থাকে। স্বষ্টি-গতভাবে মানুষের মধ্যে এ-দুটি মাত্রা রয়েছে। এদের কোন একটিকে অস্বীকার করার অর্থ হলো মানুষকে তার যথার্থ অবস্থান হতে অপসারিত করা এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই ক্ষতি করা। যাঁরা মানুষকে আধ্যা-ত্মিক বা আদর্শিক যন্ত্রে পরিণত করতে চান, তাঁরাই মানুষের মধ্যে এ-অনুভূতি স্বষ্টি করতে প্রলুব্ধ হন যে ব্যক্তি-চিন্তা অশুভ এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর। অথচ তাঁরা ভুলে যান যে একজন মানুষের সাথে অপর মানুষের সম্পর্ক আঙ্গিকও নয়, যান্ত্রিকও নয় বরং সামাজিক। অর্থাৎ তার অবস্থান একটি বিশেষ সমাজে এবং নিজস্ব প্রয়োজনেই সে সামাজিক ভাবে আবদ্ধ। একজন মানুষের বহুবিধ প্রয়োজন এবং সে-প্রয়োজন বহুমাত্রিক ও জটিল সম্পর্কের অধীন। এসব প্রয়োজন পূরণ করে সুস্থ, স্বাভাবিক ও ভারসাম্য-পূর্ণ জীবনযাপনের জন্য সমাজের ব্যক্তিবর্গ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সমাজ একটি বিমূর্ত ধারণা বিশেষ। নির্দিষ্ট স্থান ও কালে আবদ্ধ মানব জীবনের এই জটিল সম্পর্কই 'সমাজ' নামে অভিব্যক্ত। সুতরাং সমাজের প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন উপাদান হিসেবে ব্যক্তি বিসর্জিত হতে পারে না। এটি ব্যক্তি ও সমাজের স্বাভাবিক সম্পর্ক ও মৌলিক ধারণারও পরিপন্থী। অবশ্য অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বৃহত্তর ও সামগ্রিক

স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। তবে এতে ব্যক্তিস্বার্থের হেয়ত্ব প্রমাণিত হয়না বরং ব্যক্তিস্বার্থের নব দিগন্তের সূচনা হয় মাত্র। এমতাবস্থায় ব্যক্তি অমরত্ব ও মহত্ত্ব নামক ধারণার দ্বারা তাড়িত হয়। এ-সম্বন্ধে আমি প্রবন্ধের শেষ দিকে আলোচনা করবো। যা-হোক, ব্যক্তি যদি আত্মবিস্মৃত হয় এবং নিজের মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর সৃজনশীল বিকাশ না ঘটায়, তাহলে প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি হিসেবে তার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এ-বিকাশ ঘটানোর স্বাভাবিক ও সঠিক পথ কি? এখানেই ব্যক্তিত্বের সামাজিক মাত্রার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। মানুষের জনন একটি সামাজিক ঘটনা এবং অন্য মানুষের সাথে এ-ঘটনা অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। জনন থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বিভিন্নভাবে কার্যকর থাকে। ব্যক্তি, জীবনের প্রয়োজনে—তার খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, অনুভূতি ও আবেগিক প্রয়োজনে—অন্য ব্যক্তির সেবা ও সাহচর্যের আবশ্যকতা অনুভব করে। ঠিক একইভাবে সামাজিক এই বন্ধনকে সচল রাখার জন্য সেও অন্যের প্রতি এই দায়িত্ব বোধ করে, করতে বাধ্য হয়। একটা উদাহরণ দিতে পারি: মানুষ যে কেবল ভালবাসা পেতে চায়, তা-ই নয়, সে এমন প্রকৃতির অধিকারী যে কাউকে না কাউকে ভালবাসা না দিয়ে সে শান্তি পেতে পারেনা। অন্যান্য সব মানবিক অনুভূতি, বৃত্তি ও যোগ্যতা এবং গুণাবলী সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। এদের অস্তিত্বই প্রকাশের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। নইলে নীরব কবিত্বের মত এমনিতেই গুণ বা যোগ্যতার দাবী নিরর্থক। তবে সবার মধ্যে সব ধরনের গুণ ও যোগ্যতার সমরূপ উপস্থিতি দেখা যায় না। কিন্তু গুণ ও যোগ্যতার পার্থক্য হতে সম্পূর্ণ নেতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তথা মানুষের ব্যক্তিত্বের উল্লেখিত দ্বিমুখী মাত্রা ও প্রবণতাকে অস্বীকার করা যুক্তি ও বাস্তবতা-বিরোধী। মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক মাত্রার পারস্পরিক এই সম্পর্ক চাপিয়ে দেয়ার নয়। অনাকাঙ্ক্ষিত নির্দেশনার অপ্রয়োজনীয় আমদানী করলে মানুষের অন্তঃস্থ এ-প্রকৃতি আবিষ্কার ও তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়। প্রকৃতির কোলে মানব শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবর্ধিষ্ণু অবস্থা দেখতে যাঁরা সন্ত্রস্ত হন, তাঁরা বিভিন্ন বিধি-নিষেধের আচ্ছাদন দ্বারা যেমন নিজেদের চোখ ঢেকে রাখতে উৎসাহ বোধ করেন, ঠিক তেমনি নবজাতককেও সেভাবে গড়ে তুলতে প্রলুব্ধ হন। ফলে সময়ের প্রবাহে এ-ধরনের মানব-সন্তানের বয়স বাড়ে সত্যি, কিন্তু পরিশেষে সে-ও

নির্দেশনার প্রকৃতি ও প্রাবাল্য অনুযায়ী ব্যক্তিস্বার্থ বা সমাজ-আদর্শের ঘুলি সর্বস্ব একটি কৃত্রিম ও ভারসাম্যহীন প্রাণীতে পরিণত হয়। নইলে আমরা দেখতে পেতাম স্বাধীনতাই তাকে দায়িত্ববোধের মহান ব্রতে উজ্জীবিত করে তুলতো।[৫] বস্তুত, মানুষের মনুষ্যত্বের উপলব্ধিই নৈতিকতা ও পরার্থ-পরতার নিরাপদ রক্ষাকবচ। আর এটি নিজস্ব উপলব্ধির ব্যাপার—বাইরে থেকে শেখানোর নয়।

অনুকৃতি বা পরিউপস্থাপন (Representation) শিল্প-বিচার সম্পর্কীয় একটি অন্যতম মতবাদ। গ্রীক শব্দ 'mimesis'-এর ইংরেজী অনুবাদ হিসেবে 'imitation' বা 'representation' ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ-দুটোর কোনটাই যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ তাৎপর্য বহন করে না। বাংলায় এটি এক শব্দে অনুবাদ করা আরও দুরূহ। যাহোক এক শব্দে অনুবাদ করা না গেলেও এ-মতবাদের মূল বক্তব্য ব্যক্ত করা অসম্ভব নয়। সাধারণ-ভাবে এ-মত অনুযায়ী কোন আদর্শের অনুকৃতি বা কোন বিষয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ উপস্থাপনাই সাহিত্য বা শিল্পের প্রধান লক্ষ্য ও উপজীব্য। দর্শনে যেমন প্রতিভাস বা অবভাসের অন্তরালে প্রকৃতসত্তা বা স্বগতসত্তার উপলব্ধি বা জ্ঞানই মূল অন্বিষ্ট, তেমনি এ-মত অনুযায়ী জীবন, জগৎ, উপলব্ধি বা অনুভূতির কোন দিকের প্রকৃত উপস্থাপনই সাহিত্যের লক্ষ্য। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অনুকৃতি অভিব্যক্তির (expression) কাছাকাছি এসে পড়ে। তবে এ-দুয়ের মধ্যে ব্যবধান হলো অভিব্যক্তিতে যেখানে শিল্পী বা সাহিত্যিক নিজেকে প্রকাশ করেন, নিজের ব্যক্তিক অনুভূতিকে মূর্ত করে তোলার প্রয়াস পান এবং সেখানে অনেক সময় বাস্তবতার বিশেষ দিকের (Particular feature of fact or reality) প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, অনুকৃতিতে সেখানে সত্য বা আদর্শের প্রাবাল্য থাকে এবং লেখক বা শিল্পী বিশেষের মধ্য দিয়ে সত্য বা উপলব্ধির একটি নির্বিশেষ বা সর্ব-জনীন রূপ ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। শিল্প ও সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে এ-দুটোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে মতভেদ ও পরস্পর-বিরোধী বিশ্লেষণের শেষ নেই। সত্য ও আদর্শের সাথে অনুকৃতিবাদের সম্পৃক্তি এবং শব্দের মাধ্যমে তার যথার্থ চিত্রায়ণের আকাঙ্ক্ষাকে সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করার জন্য এ-মতবাদ অনেক দার্শনিক সমস্যা ও সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। অনেকের ধারণা সাহিত্যের পাশাপাশি বিভিন্ন Visual art এবং represantational art-ও এর অন্তর্ভুক্ত। অনেকে আবার

এ-মতের বিরোধী।[৬] সাহিত্যের মধ্যে কবিতা ও উপন্যাস যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে নাটক। Visual art-এর বিভিন্ন বিভাগ হলো চিত্রশিল্প (painting), ভাস্কর্য ও ছায়াছবি (film)। কেউ কেউ সঙ্গীতকেও representational art-এর অন্তর্ভুক্ত করতে চান। তাঁদের যুক্তি হলো সঙ্গীতের মধ্যে আমাদের অনুভূতি ও আবেগকে উপস্থাপন বা রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়। অনেকে আবার সঙ্গীতকে expressional art-এর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।[৭] আমি আমার এ-প্রবন্ধে সমালোচক ও তাত্ত্বিকদের এ-মতবিরোধের গভীরে যাব না। প্রবন্ধের শুরুতে ব্যক্ত উদ্দেশ্য তথা অনুকৃতি বা পরিউপস্থাপনের পরিসীমায় সাহিত্যের উপজীব্য বা লক্ষ্য কিরূপ পরিগ্রহ করে, তা-ই এখানে আমার মূল আলোচ্য। সেই সাথে প্রাসঙ্গিক দু'একটি দার্শনিক সমস্যার উপরও আমি আলোকপাত করবো।

অনেকে অনুকৃতির সাথে নির্দেশিত বিষয়কে (denotation) অভিন্ন বলে মনে করেন, যেমন মাও সে-তুং-এর ছবি দেখে একথা বলা যে এটি নব্য চীনা জাতির জনকের ছবি। ভাস্কর্য বা চিত্রের ক্ষেত্রে একথা সত্যি হতে তেমন আপত্তি নেই, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা মেনে নিলে অনেক সময় অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়। কারণ সেক্ষেত্রে আমরা সব সময় নির্দেশকের সন্ধান পাইনা। যেমন ছোটগল্প বা উপন্যাসের চরিত্রের কথা বলা যায়; কোন লেখকের সৃষ্ট চরিত্র typical হতে পারে, এবং হয়তো প্রায়শই সে-ধরনের চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা আমাদের পরিচিতদের মাঝে পাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটি 'অমুকের চরিত্র' আমরা এরূপ বলতে পারি না। কল্পিত কোন ভাস্কর্য বা সে-ধরনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এ-সব ক্ষেত্রে নির্দেশিত চরিত্র বা শিল্পকর্মকে সাহিত্যিক বা শিল্পীর সংশ্লিষ্ট জগতেই অনুসন্ধান করতে হবে এবং সে-ভাবেই তাদের মূল্যায়ন করতে হবে।[৮] তবে 'representation' অন্ধ অনুকরণ নয়। সুতরাং 'imitation' ও 'representation'-এর মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। প্রথমত, অনুকরণে একটি মহৎ শিল্পকর্মকে সামনে রেখে তার সাথে সর্বাধিক সাজুয্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে representation-এ আদর্শ হিসেবে কোন শিল্পকর্ম থাকেনা বরং মানুষের বা জগতের কোন বিশিষ্ট দিকই সেখানে প্রাকৃতিক পবিত্রতায় মূর্ত হয়ে ওঠে।[৯] বস্তুত, একজন সার্থক সাহিত্যিক এমন একটি ভুবন সৃষ্টি করেন, যেখানে তার পাঠকেরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন। অনুকৃতি বা পরিউপস্থাপন মতবাদের উদ্গাতা

হিসেবে অনেকে প্লেটো ও এরিস্টটলের কথা বলেন; কিন্তু আসলে এ-ধারণা সত্যি নয়।[১০]

দ্বিতীয়ত, representation-এ, তা সাহিত্যই হোক বা শিল্প-কর্ম, চিত্রিত চরিত্র বা শিল্পকর্মের স্থানিক ও কালিক মাত্রাকে অতিক্রম করে একটা নির্বিশেষ ও সর্বজনীন বাণী বা বক্তব্য দ্বারাই তার মহত্ত্ব নির্ণীত হয়। শেক্সপিয়রের সাহিত্য-কর্মের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে স্যামুয়েল জনসনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "His characters are not modified by the customs of particular places, unpractised by the rest of the world; by the peculiarities of studies or professions, which can operate but upon small numbers; or by the accidents of transient fashions or temporary opinions: they are the genuine progeny of common humanity, such as the world will always supply, and observation will always find."[১১] অবশ্য এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে representation-এ বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় সত্য, তবে তা সব সময়ই মূল বক্তব্যকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে।[১২] সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের মতে সাহিত্য-কর্মের মূল লক্ষ্য জনগণের সামাজিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করা। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শোষিত শ্রেণীকে শ্রেণী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা, তাদের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থে সংগঠিত হওয়ার তীব্র প্রয়োজনীয়তা উজ্জীবিত করা এবং বিজয়ের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগান সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য প্রগতিশীল লেখককে তার এ-সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে সাহিত্য-কর্মকে পরিচালিত করতে হবে। মুক্ত ও শোষণহীন সমাজে লেখকের কর্তব্য সব ধরনের সুবিধাবাদী প্রবণতাকে পরাভূত করে জনগণকে সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের পথ ধরে চলতে অঙ্গীকার-বদ্ধ রাখা এবং সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত চেতনার এ-দীপ্তিকে দেদীপ্যমান রাখা।[১৩]

আমি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলেছি যে নিছক ঘটনা বা বাস্তবের অবিমিশ্রিত বর্ণনা সাহিত্য নয়। এজন্য সৃজনশীল কল্পনার প্রয়োজন। আদর্শ চিত্রায়ণের জন্য যেমন, বাস্তবকেও আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরার জন্যও তেমনি কল্পনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। একজন বিপ্লবী হয়তো এটাকে

বলবেন "বৈপ্লবিক কল্পনা"। বস্তুত, একদিকে আদর্শের অনুকৃতি, অপর দিকে বাস্তবের উপস্থাপন—এ-দুয়ের মধ্য দিয়েই সৃজনশীল সাহিত্য বিকশিত হয়। কল্পনার মাধ্যমে আমরা বহু মনের সাথে পরিচিতি হই এবং নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে বৃহতের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করি। এ-দিকটিই শেলী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন: "A man, to be greatly good, must imagine intensely and comprehensively: he must put himself in the place of another and of many others: ...the great instrument of moral good is the imagination."[১৪] সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা অন্য মানুষের ব্যক্তিগত ও মানসিক দিকের সাথে একাত্মতা অনুভব বা একজন হতে অপর জনের বিশিষ্টতা আবিষ্কার করি। সাহিত্য আমাদের অন্য মানুষ, ঘটনা বা কোন বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতকে ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেয়। বাস্তবে কোন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে আমরা অনেকেই দেখি নাই; এমন কি অনেকে সে-বীভৎস দৃশ্যের সম্মুখীন হলে হয়তো মানসিকভাবে অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে; এমন কি ভার-সাম্যহীনও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটি চিত্রে বা সাহিত্যের মধ্যে আমরা নিবিড়ভাবে তা দেখার সুযোগ পাই। ফলে ব্যক্তিত্ব গঠন বা পরিবর্তিত করার জন্য সাহিত্যের ভূমিকা কোনক্রমেই খাট করে দেখা যায় না। আর সে-জন্য সমাজ-পরিবর্তনের বেলায় সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এ-দিকটিই representational সাহিত্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

এখন আমি অনুকৃতি বা পরিউপস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি দার্শনিক মত অতি সংক্ষেপে বিচার করবো। দার্শনিক লিবনিজই প্রথমে 'বাস্তব' (actual) ও 'সম্ভাব্য' (possible) জগতের পার্থক্য স্পষ্ট করে তোলেন এবং বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মাণে তার প্রয়োগ করেন।[১৫] রূঢ় বাস্তব—একজন ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তার প্রতিফলন তথা ব্যক্তির বাস্তব অভিজ্ঞতা, দুঃখজনকভাবে সীমিত। মহাকালের একটি অতি ক্ষুদ্রাংশে ব্যক্তির অবস্থান। নির্দিষ্ট একটি সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসীমায় তার জীবন আবদ্ধ। অপরদিকে, অলসকল্পনা—এই সীমিত বাস্তবকে অতিক্রম করার সহজাত আকাঙ্ক্ষায় যুগ যুগ ধরে লালিত মানবপ্রজাতির আদিম উত্তরাধিকার। অলস-কল্পনায় পরিণত মানুষ দুঃখ ভুলে যেতে চাইতো যেমন করে ছোট শিশু রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যেত। কিন্তু এতে আসলে মানুষের দুঃখ দূর হতো না, তার উপরে অতি

হালকা একটি প্রলেপ পড়তো মাত্র ; কারণ এ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের কোন পরিবর্তন হতো না—হতে পারতো না। রূঢ় বাস্তব ও অলস কল্পনার মাঝে লিবনিজ 'সম্ভাব্য জগৎ'-এর ধারণার সূত্রপাত করেন। সে-ঘটনা হয়তো ঘটেনি, কিন্তু ঘটতে পারে, ঘটানো সম্ভব। সে-সমাজ হয়তো নেই, কিন্তু তেমন সমাজ গঠন করা সম্ভব। সম্ভাব্য জগতে রাজ-কুমার পঙ্খীরাজের ঘোড়ায় চড়ে ঘুমন্ত রাজকুমারীকে জাগিয়ে অথবা পাতালপুরী থেকে উদ্ধার করে কল্পনায় বিয়ে করে না। অলস কল্পনার জগতে দিন আসে, রাত যায়, কিন্তু সময় প্রবাহিত হয় না। সবকিছুই ভয়ানকভাবে স্থবির, কিছুই আসলে পরিবর্তিত হয় না। শুধু একই ধরনের জিনিসের পৌনঃপুনিক সমাবেশ হয় মাত্র। কিন্তু সম্ভাব্য জগতের মানুষ আমাদের কাছাকাছি, সে-জগতের ঘটনাবলী আমাদের চতুর্পার্শ্বেরই অবস্থার প্রতিফলন। সুতরাং আমরা সে-মানুষগুলো ও ঘটনাবলীকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বুঝতে পারি। তারা আমাদের ভাষায় কথা বলে। আমাদের জীবনের ঘটনাবলীই নবরূপে সেখানে প্রতিভাত হয়। তাই শিল্পে, সাহিত্যে, চিত্রে তাদের জীবনের সেরূপ আমরা আঁকতে পারি এবং সেভাবে নিজেদের বাস্তব জীবন পরিবর্তন করতে পারি।

অবশ্য এই 'বাস্তব' ও 'সম্ভাব্য' জগতের বিশ্লেষণ নিয়ে পরবর্তীকালীন দার্শনিকদের মধ্যে নানারূপ মতবিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও পরিধি—উভয়েরই বাইরে। এখানে সাহিত্যে রাসেলের বর্ণনাতত্ত্বের (Theory of Descriptions)[১৬] একটি দিকের উপরই আমি কেবল মন্তব্য করবো। আমরা উপরে ঘটনার ত্রিমাত্রিকতা : (ক) বাস্তব, (খ) সম্ভাব্য, ও (গ) অলসকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। রাসেল যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদের সম্বন্ধ এবং বাচনিক মান (Propositional status) সম্পর্কে আলোক-পাত করেছেন। 'ফ্রান্সের বর্তমান রাজা টেকো (bald)'—এটি কোন ধরনের বচন? ব্যাকরণের কোন নিয়ম বা সূত্র এখানে লংঘিত হয়নি। সুতরাং আকারগত (formal) দিক দিয়ে বাক্যটি শুদ্ধ। কিন্তু বক্তব্যগত দিক দিয়ে এর অবস্থান কোথায়? যুক্তি বিজ্ঞানের একটি স্বীকৃত সত্য হলো : যৌক্তিক বাক্য হয় সত্য হবে অথবা মিথ্যা, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা 'truth-claim' থাকবে। কিন্তু এখানে কি তা আছে? সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হবে বচনটি মিথ্যা। কিন্তু রাসেল বিশ্লেষণ করে দেখান এটি

আসলে একটি মাত্র বচন নয়, এবং এটা কোন বাস্তব অবস্থার (state of affair) বর্ণনাও নয়, সেজন্য এখানে একতম বচনের সত্য-মিথ্যার দাবী অবান্তর। অর্থাৎ আমরা বচনটিকে তার বর্তমান গঠনে সত্যও বলতে পারিনা, মিথ্যাও বলতে পারিনা। কারণ আমরা যদি এর আকারগত সরলরূপ দেখে প্রতারিত হই এবং বলি যে বচনটি মিথ্যা তাহলে নিম্নরূপ বিভ্রান্তি ঘটে। প্রথমত, যদি বলা হয় যে রাজার "টেকো হওয়ার" অংশটি মিথ্যা, তাহলে এটা ভাবার অবকাশ থাকে যে রাজা বোধ হয় খুব চুল বিশিষ্ট বা কেশধারী। দ্বিতীয়ত, যদি বলা হয় সামগ্রিকভাবেই বচনটি মিথ্যা, তাহলে বচনটির মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে বলা হয়; কিন্তু আসলে ফ্রান্সে যে এখন কোন রাজাই নেই, সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট-ভাবে কিছু বলা হয়না। সুতরাং রাসেলের বিশ্লেষণ থেকে কেউ কেউ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান যে সাহিত্যে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন অবান্তর। আমাদের বাংলা সাহিত্য থেকে একটি অতি পরিচিত উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পে "রতন পোস্টমাস্টারের স্ত্রী ছিল" —এ-বচনটি রাসেলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী অবান্তর। কারণ পুরো গল্পটাই কাল্পনিক। বাস্তবের সাথে সত্যতার দাবীর কোনরূপ যোগসূত্রই এখানে উপস্থিত নেই। সে-কারণে বাস্তবের সাথে মিলিয়ে বচনের সত্যাসত্য নির্ণয়ের সম্ভাবনাও এখানে নেই। বস্তুত রাসেলের এ-বক্তব্য সত্য সম্পর্কে তাঁর মত অনুরূপতাবাদেরই (correspondence theory of truth) প্রতিফলন মাত্র। রাসেলের এ-মতবাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।[১৭] তবে আমি মনে করি সাহিত্যে তথা সম্ভাব্য জগতের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার দাবী অবান্তর নয়। বস্তুগত জ্ঞান ও তথ্যের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড হিসেবে অনুরূপতাবাদ নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য; কিন্তু সম্ভাব্য-জগতের ক্ষেত্রে তথ্য-নির্ভর সঙ্গতিবাদ (Coherence Theory of Truth) অধিকতর সন্তোষ-জনক বলে মনে হয়। আর এ-জন্যই শিল্প ও সাহিত্যের কোন চরিত্র বা ঘটনা সম্বন্ধে আমরা অর্থপূর্ণভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারি এবং সেভাবে তার সত্যাসত্যও নির্ধারণ করতে পারি। শুধু মনে রাখতে হবে যে এটি একটি পৃথক জগৎ। অবশ্য এ-পার্থক্য আধিবিদ্যিক মর্যাদার (Ontological Status) দিক দিয়ে নয়; বরং শিল্পী বা সাহিত্যিকের সৃষ্ট বক্তব্যের জগৎ (Universe of discourse) হিসেবে। অর্থাৎ আধিবিদ্যিক দিক দিয়ে যদিও শিল্প বা সাহিত্যের জগতের, বাস্তব জগতের বিপরীতে কোন সমান্তরাল অস্তিত্ব নেই; কিন্তু অর্থপূর্ণভাবে বক্তব্য উপস্থাপন

ও সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য এর একটি সাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থান আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্যিক আবহের মধ্যে আমরা পোস্টমাস্টারের সাথে রতনের একটি সম্পর্ক বের করতে পারি। সুতরাং অবস্থান ভিন্ন হলেও সাহিত্যের সত্য-মিথ্যা যুক্তিবিজ্ঞানের পরিসীমার বাইরে অবস্থিত নয়। অনেকে ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা-নির্ভর সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি জটিল রূপ ধারণ করে বলে মনে করেন। কিন্তু আমাদের ধারণা এখানেও সাহিত্য-কর্ম হিসেবে সত্যাসত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন আমরা ইতিহাসের সাথে সাহিত্যকে গুলিয়ে একাকার করে ফেলি। সাহিত্য বিচারের সময় মনে রাখতে হবে এটি মূলত সাহিত্য-কর্ম, ইতিহাস নয়। পক্ষান্তরে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে এবং তথ্যানুসন্ধান প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যাওয়া কোন বিশেষ যোগ-সূত্রের ক্ষেত্রেই কেবল স্থান-কাল বিশেষে তিনি বস্তু-নিষ্ঠ কল্পনার মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রকল্প (probable hypothesis) প্রণয়ন করতে পারেন। অবশ্য কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে ইতিহাস-নির্ভর সাহিত্য রচনা করা সম্ভব কিনা, তাহলে অবশ্য সেটা ভিন্ন বিতর্কের অবকাশ রাখে। আমি মনে করি একজন সাহিত্যিক বা শিল্পী সম্ভাব্য জগতের রূপই তাঁর সাহিত্য-কর্ম বা শিল্পের মাধ্যমে চিত্রায়িত করেন। তাঁদের এ-ভূমিকা অস্বীকার করার অর্থ হলো হয় আমাদের রূঢ় বাস্তবের ভয়াবহ সীমাবদ্ধতায় নির্বাসিত ও আবদ্ধ হওয়া, অথবা অলস কল্পনার রথে সওয়ার হয়ে তেপান্তরের মাঠে হারিয়ে যাওয়ার অন্যতর বিকল্পকে অনুমোদন করা।

উপরের আলোচনায় আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি যে যদি মানুষকে স্বাধীন ভাবে তার হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করতে দেয়া হয়, তাতে আশংকিত হওয়ার কিছু নেই। রূঢ় বাস্তব ও অলস-কল্পনার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্ভাব্য জগতের রূপই শিল্পী বা সাহিত্যিকের শিল্পে বা লেখায় মূর্ত হয়ে উঠবে; আর মানবমনের সুস্থ বিকাশ ও মানব-প্রতিভার সৃজন-শীল মুক্তি ও স্ফূর্তির জন্য এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এখন আমি প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ মুক্ত সাহিত্য পরিশেষে তথ্যের মাধ্যমে সত্যে উপনীত হয় এবং সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কারধর্মী রূপ পরিগ্রহ করে—এ-বিষয়টি প্রমাণ করতে চাইবো।

উপরের আলোচনা হতে একটি জিনিষ স্পষ্ট হওয়ার কথা যে, মানুষ যা খুশী ভাবতে পারেনা, এবং যা ইচ্ছা তা করতে পারেনা। এ-ধরনের

নৈরাজ্যজনক অবস্থা স্বীকার করে নিলেও তা সাময়িক। দ্বিতীয়ত, জগতের দিকে তাকালে আমরা দেখবো জগৎ মহাবৈচিত্র্যের একটি অপূর্ব সমাহার। এ-বৈচিত্র্য তার নিয়মের মধ্যে, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে, এমন কি পরিব্যাপ্ত প্রকৃতির মাঝে। কোথাও সমুদ্র, কোথাও পাহাড়, কোথাও মরুভূমি, কোথাও সবুজ বনানী—কখনও শীত, কখনও গ্রীষ্ম। অর্থাৎ বিশ্ব একটি বৈচিত্র্যহীন একতম ঘটনার বা অবস্থার সমষ্টি নয়। এ-কথা মানব-সমাজ ও ব্যক্তি-মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেজন্য নৈর্ব্যক্তিকভাবে মানব-সমাজের একটি অখণ্ড ও সর্বজনীন রূপ যেমন আছে, তেমনি আছে তার বিশেষ স্থানিক ও কালিক মাত্রা। এ-উভয় দিকই সমভাবে সত্যি এবং জীবন ও জগতের, বিশেষতঃ মানুষের ব্যক্তিত্বের এ-দ্বিবিধরূপই শিল্পে ও সাহিত্যে অনুকৃতি বা পরিউপস্থাপনের আদর্শের মধ্যে বিধৃত। এজন্য আমার যুক্তি হলো নৈরাজ্যের কোন স্থায়ী ও বিশ্বব্যাপী রূপ হতে পারেনা। যারা বর্তমানে জগৎব্যাপী তারুণ্যের বিদ্রোহ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতিকে বড় করে দেখান, তারা জগতের একটি দিকের অতিরঞ্জন করেন এবং অন্যান্য অনেক শুভ দিকই উপেক্ষা করেন। অধিকন্তু, ইতিহাস ও মানব-সমাজ পিছনের দিকে যায়না। ইতিহাসের অগ্রগামিতায় বিশ্বাস প্রগতির মূল চালিকা-শক্তি। সেজন্য কোন ব্যক্তি বা সমাজের সাময়িক ও স্থানিক বিচ্যুতিকে পশ্চাৎগামিতা ও স্থবিরতা হিসেবে নয়, বরং 'পরীক্ষামূলক স্তর' (Experimental Stage) ও 'বিশ্রাম' হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত বলে আমি মনে করি।

অতীত ইতিহাস, বিভিন্ন মানব-সভ্যতার উত্থান-পতন এবং মানব-সমাজের বিকাশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমার কথার সত্যতা মিলবে। আমি সেজন্য পুনর্বার উচ্চারণ করতে চাই যে কল্পনা অবাধ হতে পারেনা—কল্পনার নিয়ম আছে, অন্তঃস্থ নিয়ন্ত্রণ আছে। জৈবিকতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে ভীতির কিছু নেই। এটাই বিকশিত হয়ে উপযোগবাদিতা, নৈতিকতা ও মানবতার দিকে যেমন ব্যক্তি-জীবনকে, তেমনি সমাজ-জীবনকেও নিয়ে যায়। আমি যদি অপরকে আঘাত করি, তাহলে সেও আমাকে আঘাত করবে—এ-উপলব্ধিজাত tension-ই 'অহং' (ego)-এর মধ্যে সৃজনশীল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করবে। বস্তুত, অহং-এর মধ্যে স্বাধীনতা ও দায়িত্বের ক্রমাগত দ্বন্দ্বই পরিশেষে মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। মানুষ অন্যায় করতে পারে, কিন্তু সে তা যুক্তি-সিদ্ধ (justify) করতে

পারেনা। কোন আদর্শই অন্যায় ও অশুভ (disvalue)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ মানুষ অন্যায়ের কোন জয়গান গাইতে পারেনা। মিথ্যা, চুরি, প্রতারণাকে ব্যক্তি সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এর ভিত্তিতে কোন মহৎ সাহিত্য বা শিল্পের সৃষ্টি হতে পারেনা। এজন্য ডাকাতিকে যুক্তিসিদ্ধ করতে হলে লুণ্ঠিত সে-সম্পদকে দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়ার আদর্শ সংযোজন করতে হয়। Disvalues-এর ভিত্তিতে যদিও কোন শিল্প বা সাহিত্য রচনা করা হয়, তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থাকে এদের বীভৎসতা তুলে ধরা। এঙ্গেলম্যান যথার্থই বলেছেন: "All human culture is based on faith in the existence of a higher sphere."[১৮] মার্কসবাদকে বিশ্বজুড়ে ঈশ্বর-বিরোধী বলে নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু তা কি নৈতিকতা-বর্জিত? নিশ্চয়ই নয়।

অনেকে বাস্তবতার নামে আদর্শ ও সৃজনশীল কল্পনার বিরোধিতা করেন। আমার মনে হয় তারা বিষয়টি গভীরভাবে না দেখে এ-ধরনের মন্তব্য করেন। সাহিত্য বা শিল্পেই শুধু নয়, এমন কি রাজনীতিতেও নিছক তথ্যের সমষ্টিই প্রকৃত বাস্তবতা নয়। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতাংশ "ঘটে যা তা সব সত্য নহে", সাহিত্যের মূল দর্শনকে সরলভাবে কিন্তু প্রবল সার্থকতার সাথে বিবৃত করেছে। রোমান্টিক বিপ্লবী বা স্বপ্ন-বিলাসীদের (utopian) কথা না-ই বা ধরলাম, যারা বাস্তবতার কথা জোরে-সোরে ও সবচেয়ে দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করেন এবং অন্যদের অবাস্তব বলে সমালোচনা করেন, তাদের মধ্যে দুটো বড় প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠীর কথা আমি এখানে উল্লেখ করবো। প্রথমে ধরা যাক সমাজবাদীদের কথা। একজন প্রকৃত সমাজবাদী কি তার চতুর্পার্শ্বে যা ঘটছে 'বাস্তবতা' বলতে তাই বোঝাতে চান এবং বাস্তবকে মেনে নেয়ার অর্থে তিনি কি সব ঘটনাকেই মেনে নেয়ার জন্য সুপারিশ করেন? নিশ্চয়ই না। কারণ তাহলে সব ধরনের অন্যায়, অবিচার ও শোষণকেই মেনে নিতে হয়। বক্তব্য দীর্ঘ না করে সংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে একজন সমাজবাদীর দৃষ্টিতে বাস্তব-তার অর্থ সব সংঘটিত ঘটনা মেনে নেয়া নয়। বরং এর বিপরীতে তিনি বৈপ্লবিক চেতনায় তার চতুর্পার্শ্বের সব ধরনের সংকীর্ণ বাস্তবতা ও নীচতাকে অতিক্রম করে যেন অনেকটা স্বাপ্নিক ও আদর্শবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সম্ভাব্য জগতের অনুকরণে চলমান ঘটনাবলী ও তার অবস্থানকে পরিবর্তন করতে চান। বস্তুত তাঁর এই সম্ভাব্য জগতের ধারণাই

তাঁকে রোমাণ্টিক ও স্বপ্নবিলাসী বিপ্লবী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। অথবা একজন জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী যিনি তাঁর জাতীয় স্বার্থকে বিজাতীয় শোষকের কাছে পদদলিত হতে দেখেন, তিনি কি বাস্তববাদী হওয়ার দায়ে এই বিজাতীয় শোষণ সমর্থক করার কথা বলেন? অবশ্যই নয়। তিনিও আদর্শের চেতনার তীব্রতায় তাঁর পরিবেশের ঘটমান বর্তমানকে অস্বীকার করেন এবং তাঁর কাঙ্ক্ষিত আদর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন। যদি বিপ্লবীদের দৃষ্টি কেবল বর্তমানের সুখ বা দুঃখের প্রতিই নিবদ্ধ হতো তাহলে পরিণতিতে সুবিধাবাদী হওয়া ছাড়া তাঁদের জন্য অন্য কোন পথ উন্মুক্ত থাকতো না। সুতরাং সুবিধাবাদীদের দৃষ্টি যেখানে সংকীর্ণ বাস্তব ও সাময়িক ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির দিকে কেন্দ্রীভূত, একজন বিপ্লবী সেখানে বাস্তবের পথ ধরে সম্ভাব্য কিন্তু বৃহৎ জগতের দিকে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করেন। বর্তমানের সুখকে উপেক্ষা করে দুঃখকে তিনি আলিঙ্গন করেন সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য। কেবল একজন বিপ্লবীর মধ্যে নয়, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই স্বপ্ন ও আদর্শ বিদ্যমান। প্রতিটি ব্যক্তিই বিশেষ পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সে তার চেতনার আলোকে, তার আকাঙ্ক্ষার প্রেষণায় সে-পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করতে চায়। বস্তুত মানুষ যদি যা ঘটে তার সবকিছুই মেনে নিতো এবং কেবল প্রাপ্ত জিনিসেই পরিতৃপ্ত হতো তাহলে মানব-সভ্যতা এ-পর্যায়ে না এসে গুহাস্থ স্তরেই আবদ্ধ থাকতো; এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও সাহিত্য তথা জীবনের কোন কিছুতেই পরিবর্তন হতোনা। মানুষের জাগতিক পরিবর্তন স্বর্গীয় কোন দূত সম্পাদন করে দেয়নি বরং মানুষের অন্তঃস্থ এই 'অতিবর্তী প্রবণতা' (Transcendental urge)-ই এ-সমুদয় পরিবর্তনের মূলীভূত কারণ। সেজন্য একজন প্রকৃত বিপ্লবী যেমন একদিকে বাস্তববাদী, অপরদিকে স্বাপ্নিক ও আদর্শবাদী; ঠিক তেমনি যথার্থ সাহিত্যও তথ্যসমৃদ্ধ সন্দেহ নেই, কিন্তু একই সময়ে তা সে-সব তথ্যকে অতিক্রম করে এবং তথ্য যে সত্যের ইঙ্গিত দেয় তারও যুগপৎ ধারক ও বাহক।

প্রবন্ধের প্রথম দিকে আমি উল্লেখ করছি যে disvalue বা অশুভ, অন্যায় ও অনৈতিকতার উপর ভিত্তি করে কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। কারণ অন্যায়, অসত্য ও অনৈতিকতার কোন সদর্থক ও সর্বজনীন রূপ নেই। এটি অন্ধকারের মত। অন্ধকার আলো না থাকারই নাম।

আলো এসে গেলে অন্ধকারের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। সে-জন্য দেখা যায় ধিকৃত পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য আজকে যে-সব যুক্তির অবতারণা করা হয়, সেগুলো ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানব-কল্যাণ, ধর্ম প্রভৃতি আদর্শের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে। বস্তুত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে নির্বিশেষ ও সর্বজনীন ভিত্তি ব্যতীত কোন মহত্ত্বের দাবী উত্থাপিত হয়নি। মানুষ তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যখন তার মধ্যে উল্লেখিত 'অতিবর্তী প্রবণতা' প্রবলরূপ লাভ করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এ-পর্যায়ে মানুষ অন্যের মাঝে নিজেকে প্রকাশিত করতে চায় এবং অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু একজন মানুষ যদি কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ ও তাৎক্ষণিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মধ্যে তার সব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি দেখে, তাহলে সঙ্গত কারণেই অন্য মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কোন ভিত খুঁজে পায়না। আর এমনি ধরনের মানুষ অন্যকেও নিজের দিকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। বস্তুত স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার অভিন্ন যোগসূত্র ব্যতীত একজন মানুষের সাথে অপর মানুষের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের অন্য কোন বিকল্প নেই। মানব-প্রকৃতির এ-দিকটি আবিষ্কৃত হওয়া এবং এ-সম্বন্ধে চেতনা বৃদ্ধির পথ ধরে একজন মানুষ এমন সম্ভাব্য আদর্শের অনুসন্ধান করে যা তার ও সমাজের অন্য মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করবে। অধিকন্তু, মানুষ যা পছন্দ করে তা অন্যের মাঝে সঞ্চারিত করতে চায়। আনন্দ যেমন একাকী পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না, ঠিক তেমনি কোন ভাব বা আদর্শও ব্যক্তির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। এ-জন্য আত্ম-পরিচিতি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের এ-স্তরে মানুষ অবশ্যই প্রচারধর্মী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এটি কোন বহিঃস্থ চাপের ফলে নয়, বরং মানুষের অন্তঃস্থ আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনই এখানে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। উপলব্ধি ও চেতনার স্বাভাবিকতায় মানুষ তখন তার স্ব-আবিষ্কৃত সম্ভাব্য জগতের বাস্তবায়ন কামনা করে এবং নিজস্ব পরিমণ্ডলকে পরিবর্তন করতে নিজ থেকেই তাড়া অনুভব করে। এটাই সাহিত্যে সংস্কারধর্মী রূপ পরিগ্রহ করে। অনুকৃতি বা পরিউপস্থাপনবাদ সে-জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নান্দনিক মানদণ্ড। শিল্প ও সাহিত্যের যথার্থ বিচার এবং তার দার্শনিক পটভূমি বিধৃত করার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা তাই অনস্বীকার্য।

তথ্যসঙ্কেত

১ রোবট, কমপিউটার প্রভৃতি কৃত্রিম কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত (?) যন্ত্র সম্বন্ধে, বিশেষত মানুষ ও তাদের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য নিয়ে বর্তমানে পাশ্চাত্যে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। কেউ কেউ নীতিগতভাবে এ-পার্থক্য অস্বীকার করতে চান এ যুক্তিতে যে যৌক্তিকভাবে এটি অসম্ভব নয় যে বিজ্ঞান হয়তো এমন যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে যা নিজেই প্রগ্রাম প্রণয়ন করতে পারবে। কেউ কেউ এমন আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন যে সৃজনশীল কমপিউটার উদ্ভাবন করাও অসম্ভব নয় যা মানবিক প্রজনন প্রক্রিয়ার মত নিজেরাই পরবর্তী কমপিউটার উদ্ভাবন, মেরামত বা সংস্কার করতে সক্ষম হবে। বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির বাইরে বিধায় আমি এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করা থেকে বিরত রইলাম। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, J. J. C. Smart, "Professor Ziff on Robots" in A. R. Anderson(ed.) *Minds and Machines*, (New Jersey : Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, 1964), pp. 104-05

২ আল-কোরআন, ৩৬: ৬৬-৬৭; ৪৩:৬০ ; ৭৬:৩ ইত্যাদি।

৩ David Hume, *A Treastise* of *Human Nature*, ed. by L.A. Selby-Biggy (Oxford : Clarendon Press, 1978), pp. 1-25

৪ Rene Descartes, *The Philosophical Writings of Descartes* Tr. by Elizabeth S. Haldane and G. R. T. Ross, Vol. I (London : Cambridge Univ. Press 1967) , pp. 144-50

৫ Jean Paul Sertre, *Existentialism and Humanism*, Tr. by Philip Mairet (London : Methuen be Co. Ltd, 1948), pp. 34, 48, 50-52, 55-56

৬ Harold Osborne, *The Appreciation of Arts*, (London: Oxford Univ. Press, 1970), p. 139

৭ R. A. Sharpe, *Contemporary Aesthetics*, (Brighton ; Sussex : The Harvester Press, 1983), pp. 49-50; 93-94

৮ Roger Scruton, *Art & Imagination* (London : Methuen and Co. Ltd,. 1974), pp. 191-92

৯ R. G. CollingWood, *The Principles of Art* (London : Oxford Univ. Press, 1974), p. 42

১০ Ibid., pp. 42, 46-52

১১ As quoted in Sharpe, *Contemporary Aesthetics*, P. 75

১২ Stefan Morawski, *Inquiries into the Fundamentals of Aesthetics* (London, England and Cambridge, Massachusetts, the MIT Press, 1974), p. 214

১৩ Mao Tse-Tung, *Selected Works* (Peking : Foreign Languages Press, 1967), Vol. III, pp. 69-97

১৪ Quoted in *Contemporary Aesthetics*, p. 76

১৫ G. W. Leibniz, *Philosophical Writings* Tr. by Mary Morris and G. H. R. Parkinson (London: J. M. Dent and Sons Sons Ltd., 1973), pp. 54, 187

১৬ Bertrand Russell, "on Denoting", *Mind*, New Series, Vol. XIV (1905), pp. 479-93 ; Also cf. G. E. Moore's article, "Russell's 'Theory of Descriptions' " in P. A. Schilpp (ed.) *The Philosophy of Bertrand Russell* (New York : Tudoy Publishing Co., 3rd ed., 1951), pp.177-225

১৭ P. F. Strawson, "On Referring" in his *Logico-Linguistic Papers* (London: Methuen ; Co Ltd., 1971), pp. 11-27

১৮ Paul Eugelmann, *Letters From Ludwig Wittgenstein With a Memoir* (Oxford: Basil Blackwell, 1967), p. 130